শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা

জার্মানিভিত্তিক উন্নয়ন সংস্থা জিআইজেড বাংলাদেশ ও প্রথম আলোর আয়োজনে এবং লাউডেস ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ‘শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা’ শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৫ মার্চ ২০২২। আলোচকদের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে এই ক্রোড়পত্রে ছাপা হলো।

অংশগ্রহণকারী

মুজিবুল হক, এমপি
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি।

আহসান এইচ মনসুর
নির্বাহী পরিচালক, পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই)

সৈয়দ সাদ হোসেন গিলানী
প্রধান কারিগরি উপদেষ্টা, আইএলও বাংলাদেশ

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম
গবেষণা পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ

ফজলুল হক
সাবেক সভাপতি, বিকেএমইএ

রাজেকুজ্জামান রতন
সভাপতি, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট

কোহিনুর মাহমুদ
ডিরেক্টর, প্রোগ্রাম ও ইনফরমেশন, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস)

সৈয়দ আব্দুল হামিদ
অধ্যাপক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সায়েমা হক বিদিশা
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষণা পরিচালক, সানেম

মরিয়ম নেছা
ম্যানেজার, উইমেন রাইটস অ্যান্ড জেন্ডার ইকুইটি, একশনএইড বাংলাদেশ।

ফিরোজ আলম
জ্যেষ্ঠ কারিগরি উপদেষ্টা, জিআইজেড বাংলাদেশ

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন :

নওশিন শাফিনাজ শাহ
জাতীয় সমন্বয়ক, ইআইআই প্রকল্প, আইএলও বাংলাদেশ

নুজহাত জেবিন
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ইকোনমিক জাস্টিস, ক্রিশ্চিয়ান এইড বাংলাদেশ

সূচনা বক্তব্য
আব্দুল কাইয়ুম
সহযোগী সম্পাদক, *প্রথম আলো*

সঞ্চালনা
ফিরোজ চৌধুরী
সহকারী সম্পাদক, *প্রথম আলো*

সুপারিশ

- আমাদের উচ্চ আয়ের দেশে পৌঁছাতে হলে শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে।
- একজন শ্রমিকের বেতন, ভাতা, ছুটিসহ চাকরির নিরাপত্তা অত্যন্ত জরুরি।
- শ্রমিকদের ইউনিভার্সাল সুরক্ষার আওতায় আনতে হবে।
- দেশে প্রায় ৬ কোটি ৮২ লাখ শ্রমিক আছেন, সবার সামাজিক সুরক্ষার কথা ভাবতে হবে।
- শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য মালিক, শ্রমিক, সরকারসহ সবার সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।
- শ্রমিকের স্বাস্থ্যবিমা নিশ্চিত করতে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ অথবা সেন্ট্রাল ফান্ডকেন্দ্রিক একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করতে হবে।
- শ্রমিকের ইনজুরি সুরক্ষা প্রকল্প জরুরি। এটা হওয়া দরকার। এর সঙ্গে স্বাস্থ্যের বিষয়টি আনতে হবে।
- শ্রমিককল্যাণ সেন্ট্রাল ফান্ড থেকে কীভাবে শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়া যায়, সেটা ভাবা যেতে পারে।

আলোচনা

আব্দুল কাইয়ুম

শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের নানাবিধ উন্নয়ন টেকসই হবে না, যদি শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত না হয়। এক অর্থে এটা হলো শ্রমিকের আর্থিক নিরাপত্তা। তাঁর বেতন, ভাতা, ছুটিসহ চাকরির নিরাপত্তা অত্যন্ত জরুরি। সরকারি-বেসরকারি সব কর্মজীবীর জন্য পেনসনের কথা ভাবা হচ্ছে। এটা একটা ভালো দিক।

শ্রমিকের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে তিনি নিশ্চিন্ত মনে কাজ করতে পারবেন। তাহলে তাঁর থেকে প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বেশি সুবিধা নিতে পারবে। আজকের আলোচনায় এসব বিষয় আসবে বলে আশা করি।

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

বাংলাদেশের শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তায় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। এখন একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দরকার। এ ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগও শুরু হয়েছে। শ্রমিকের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য কী করণীয়, সে বিষয় আলোচনার চেষ্টা করব। আয় নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য একটা সমাজের ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়া হয়। একজন মানুষ বয়স্ক হয়ে যাওয়া, চাকরি না থাকা, অসুস্থ হওয়া, নারীদের গর্ভকালীন স্বাস্থ্যের নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন কারণে সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজন হয়। এত দিন এ বিষয়গুলো তেমনভাবে চিন্তায় ছিল না। কিন্তু আমাদের উচ্চ আয়ের দেশে পৌঁছাতে হলে এগুলো লাগবেই।

সরকারকে ধন্যবাদ এ জন্য যে এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ উদ্যোগগুলো সব জায়গায় সমপর্যায়ে পৌঁছায়নি। মোট বয়স্ক জনগোষ্ঠীর ৩৯ শতাংশ, শিশুদের ২৯ শতাংশ, গর্ভবতী নারীদের ২১ শতাংশ ও আহতদের ১৮ শতাংশ সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা পান। কিন্তু সেই তুলনায় শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা একেবারেই কম। কেবল আহত শ্রমিকের ১২ দশমিক ৫ শতাংশ এ ভাতা পান। কিন্তু শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা কম।

আমাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে। ২০২৬ সালে স্বল্প আয়ের দেশ থেকে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশে ঢুকব। এ সময়ের মধ্যে অনেক সামাজিক সূচকে উন্নতি করতে হবে। এর মধ্যে অবশ্যই শ্রমিকের সামাজিক সূচকেও উন্নতি করতে হবে। ২০৩১ সালে উচ্চমধ্যম আয় ও ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হব। তখন আমাদের মাথাপিছু আয় হবে যথাক্রমে ৪ হাজার ও ১২ হাজার ৫০০ ডলার। এই স্তরে অন্যান্য দেশের সামাজিক সুরক্ষার তুলনায় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। ২০৪১ সালে দেশে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা অনেক বাড়বে। তাঁদের জন্য বড় ধরনের সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজন হবে। এ জন্য কি আমাদের কোনো প্রস্তুতি আছে?

শ্রমজীবী গর্ভবতী নারী, অসুস্থ শ্রমিক, আহত শ্রমিক, বেকার শ্রমিক—এঁদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা অত্যন্ত জরুরি। কারণ, এই সময় তাঁদের আয় থাকে না। তাঁরা ভীষণ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েন। এসব ক্ষেত্রে শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা নেই। তবে আশার কথা হলো, সরকারের দিক থেকে ইউনিভার্সাল পেনশন স্কিমের কথা বলা হচ্ছে। এটা কার্যকর হওয়া উচিত। সরকার জিডিপির ৩ দশমিক ১ শতাংশ সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় করছে। কোভিডকালে এটা আরও বেড়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা, স্টাইপেন্ড, নগদ হস্তান্তর, ক্রেডিট সাপোর্ট ইত্যাদির মাধ্যমে নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে।

মাতৃত্বকালীন ছুটি, বয়স্ক, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ অনেকের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা আছে। কিন্তু শ্রমিক আহত ও বেকার হলে তাঁর জন্য তেমন কোনো নিরাপত্তা নেই। কিন্তু করোনার সময় ইউরোপিয়ান তহবিলের সহযোগিতায় বেকার শ্রমিকদের আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষার জন্য এখনই প্রস্তুতি নিতে হবে।

রাজেকুজ্জামান রতন

শ্রমিকের বেকার হওয়া, সঞ্চয় না থাকা, মালিকদের দায়িত্ব না নেওয়া, সরকারের প্রস্তুতি না থাকা—এসব বিষয়ে কোভিড আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। কিন্তু আমরা কী দেখেছি? একজন শ্রমিক সমাজের জন্য উৎপাদন করেন। কিন্তু কোনো কারণে দুর্ঘটনায় পড়লে এর সব দায় তাঁকে একাই নিতে হয়। দেশে প্রায় সাত কোটি শ্রমজীবী মানুষ। সরকার মাসে এক হাজার টাকা পেনশন স্কিম দেওয়ার কথা বলেছে। কিন্তু পোশাকশিল্পের একজন শ্রমিকের মূল বেতন ৫ হাজার ৩০০ টাকা। এর ১ শতাংশ হলো ৫৩ টাকা। যদি মালিক ও সরকার শ্রমিকদের জন্য প্রতি মাসে ৫৩ টাকা করে দেয়, তাহলে বছরে প্রায় ৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকার তহবিল হয়।

বছরে গড়ে প্রায় ১ হাজার ৩০০ শ্রমিকের মৃত্যু হয়। আহত হন প্রায় ১০ হাজার। নিহত শ্রমিকদের ১৫ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিলে বছরে প্রয়োজন হয় ১৮০ কোটি টাকা। আহত শ্রমিকদের জন্য যদি ৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ ও ৫ লাখ টাকা চিকিৎসার জন্য রাখা হয়, তাহলে এখানে প্রয়োজন হবে ১ হাজার কোটি টাকা।

১ হাজার ১৮০ কোটি টাকায় আহত শ্রমিকদের ইউনিভার্সাল সুরক্ষার আওতায় আনা যায়। এভাবে শ্রমিকদের নিরাপত্তা দিতে পারলে তাঁরা কাজে উৎসাহ পাবেন। আরও বেশি মনোযোগী হবেন। শ্রমিকেরা বিভিন্ন বিষয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করার সময় কারখানায় আগুন দেন, অনেক কিছু ধ্বংস করেন। কিন্তু দেখেন যে পাটকলের শ্রমিকেরা কখনো কারখানায় আঘাত করেননি। কারণ, তাঁরা মনে করেন, এই কারখানা তাঁদের বাঁচিয়ে রাখে, নিরাপত্তা দেয়। কারণ, এখান থেকে তাঁরা অনেক সুযোগ-সুবিধা পান। অবসরে গেলে টাকা পান। সব সময় পোশাকশ্রমিকের কথা বলা হয়। কিন্তু এর বাইরে আরও প্রায় সাড়ে ৬ কোটি শ্রমিক আছেন। তাঁদের কাজের নিশ্চয়তা কোথায়।

প্রত্যেক শ্রমিকের একটা রেজিস্ট্রেশন কার্ড থাকবে। প্রতি মাসে মালিক তাঁর হিসাবে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দেবেন। এটা তাঁর হেলথ ও রেশন কার্ড হিসেবে কাজ করবে। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে তিনি সামাজিক নিরাপত্তা পাবেন। মালয়েশিয়ায় প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা প্রত্যেক শ্রমিকের মজুরির দশমিক ৮ শতাংশ জমা রাখেন। এভাবে তাঁদের প্রায় ৬ বিলিয়ন রিঙ্গিত জমা হয়েছে। এটা দিয়ে তাঁরা খুব ভালোভাবে শ্রমিকের সুরক্ষা নিশ্চিত করেন। কম্বোডিয়ায় মাথাপিছু আয় কম। আমাদের থেকে তারা দরিদ্র। তারাও শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। কিন্তু আমরা কেন পারছি না। এ ক্ষেত্রে আমাদের কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

সৈয়দ আব্দুল হামিদ

পোশাকশিল্পের প্রায় ৬০ হাজার শ্রমিকের জন্য বিমার একটি পাইলট প্রকল্প হয়েছিল। নেদারল্যান্ডসভিত্তিক উন্নয়ন সংস্থা এসএনভি, গণস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি এটা করেছিল। পাইলট প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ অথবা সেন্ট্রাল ফান্ডকেন্দ্রিক একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করা। আমাদের প্রস্তাব ছিল সেন্ট্রাল ফান্ডের অধীনে শ্রমিকের স্বাস্থ্যবিমা চালু করা। এরপর আর আলোচনা এগোয়নি। ৪০ লাখ শ্রমিকের মধ্যে মাত্র ৬০ হাজার শ্রমিককে বিমার আওতায় এনেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এর শিক্ষাটা এখন পর্যন্ত কাজে লাগানো হলো না। এখানে মালিক, শ্রমিক, সরকার, ক্রেতাসহ সবার সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

এ বিমার দু-একটা স্কিম এখনো চালু আছে। হয়তো এক-দুই বছরে এটাও শেষ হবে। শ্রমিকদের ইনজুরি সুরক্ষা প্রকল্প জরুরি। এটা হওয়া দরকার। এর সঙ্গে স্বাস্থ্যের বিষয়টি আনতে হবে। পেনশন স্কিম চালু করা গেলে সেটাও একটা বড় কাজ হবে। আমাদের বড় সমস্যা হলো, সবকিছু শুরু করি, শেষ করতে পারি না। মাঝপথে আটকে যায়। কোথাও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা নেই। কাউকে অবসরের পর ও ডেপুটেশনে দায়িত্ব দিলে তাঁরা তেমন কাজ করেন না। এসব ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে চিন্তা করতে হবে। সর্বোপরি আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

ফজলুল হক

শ্রমিকের যেকোনো আলোচনায় পোশাককর্মীদের অনেক বেশি ফোকাস করা হয়। প্রায় সব সময় তাঁরা সামনে আসে। তাই পোশাকশিল্পের কর্মীদের সঙ্গে টেক্সটাইল ও ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরের শ্রমিকদের আলাদা করা প্রয়োজন। তা না হলে অন্য খাতের কয়েক লাখ শ্রমিকের বিষয়টি সামনে আসছে না। এ জন্য শ্রমিকদের মধ্যেই একটা বৈষম্য তৈরি হয়েছে। আবার পোশাক খাতকে গুরুত্ব দেওয়ায় এ খাতের অনেক উন্নতি হয়েছে সন্দেহ নেই। কারণ, ২০ বছর আগের পোশাকশিল্প আর আজকের পোশাকশিল্পের মধ্যে অনেক পার্থক্য। দেশে প্রায় সব শিল্প অপরিকল্পিতভাবে শুরু হয়। তারপর ধাক্কা খেয়ে একটি জায়গায় আসে। পোশাকশিল্পের ক্ষেত্রেও এমন হয়েছে। বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের নিরাপত্তা বিশ্বে এক নম্বর। সবুজ কারখানার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ এক নম্বর।

শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টিতে মালিক থেকে সরকারের দায়িত্ব অনেক বেশি। আবার সরকার হয়তো ধরে নিয়েছে, শ্রমিকেরা হয়তো কিছু আয় করছেন। তাঁদের থেকেও যাঁরা খারাপ অবস্থায় আছেন, সরকার তাঁদের বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে সরকারের একটা আলাদা অ্যাজেন্ডা থাকা প্রয়োজন। আমাদের মধ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মুজিবুল হক চুন্নু আছেন। তিনি সংসদে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

আমরা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও কর্মস্থলের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দিতে চেষ্টা করি। আমার জানামতে, বিদেশেও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি সরকারই বেশি দেখে। কয়েক বছর ধরে মালিকেরা শ্রমিকের কল্যাণে কাজ করছেন। আমরা শ্রমিককল্যাণে সেন্ট্রাল ফান্ড টাকা দিচ্ছি। এ তহবিল থেকে কীভাবে শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়া যায়, সেটাও ভাবা যেতে পারে।

প্রয়োজনে এ তহবিল আরও বড় করা যেতে পারে। এ তহবিলে মালিকেরা অর্থ দিয়ে অংশগ্রহণ করছেন। খুব সামান্য অর্থ দিয়ে শ্রমিকেরাও যদি এ তহবিলে অংশগ্রহণ করেন, তাহলে তাঁদের একটা অধিকার সৃষ্টি হয়। দুর্নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাবের ঊর্ধ্বে উঠে যদি এ তহবিলের কার্যকর ব্যবহার করা যায়, তাহলে শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা আরও অনেক বেশি নিশ্চিত করা যাবে।

আহসান এইচ মনসুর

দেশের উন্নয়নের সঙ্গে আমাদের সামাজিক উন্নয়ন করতে হবে। কিন্তু সরকার সামাজিক কাজকে অনেক ক্ষেত্রে তাদের বদান্যতা মনে করে। মানুষের যে অধিকার আছে, সমাজকল্যাণ কার্যক্রমে এখনো সেটা তেমনভাবে স্বীকৃত নয়। আমাদের দেশের দারিদ্র্যরেখার প্রায় একটু ওপরে ৩০ শতাংশ মানুষ থাকেন, যাঁরা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অসুস্থ হলে তাঁরা আবার দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে আসেন। আমাদের একধরনের সুরক্ষা পদ্ধতি দরকার, যেন এসব অবস্থা মোকাবিলা করা যায়। সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম আছে। গর্ভবতী মায়েদের জন্য সরকারের আর্থিক সহযোগিতা আছে। স্কুলের ক্ষেত্রেও সরকারের খুব ভালো সহযোগিতা আছে। প্রায় শতভাগ শিশু স্কুলে ভর্তি হচ্ছে।

সরকারি চাকরিজীবীরা পেনশনসহ নানাভাবে সুরক্ষিত। তাঁদের একটা শক্তিশালী সুরক্ষা পদ্ধতি আছে। ব্যক্তি খাতের চাকরিজীবীদের জন্য খুব সীমিত আকারে কোথাও কোথাও প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আবার সমস্যাও আছে। আর স্বনিয়োগের ক্ষেত্রে কিছুই নেই। সরকার ৩ দশমিক ১ শতাংশ সামাজিক নিরাপত্তায় ব্যয় করছে। কিন্তু পেনশনের টাকা বাদ দিলে এটা ১ দশমিক ৬ থেকে ৮ শতাংশের মধ্যে থাকে। এটা দেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত কম। তাই সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সরকারের ব্যয় আরও বাড়াতে হবে।

আমাদের সঠিক তথ্যের অভাব আছে। কতজন বেকার, কতজন শ্রমিক চাকরি করছেন বা দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কত, তার কোনো সঠিক তথ্য নেই। এ জায়গায় জোর দিতে হবে। আমাদের যদি সঠিক তথ্য না থাকে, তাহলে যে উদ্যোগই নেওয়া হোক না কেন, লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না। বাংলাদেশে কর্মসূচির অভাব নেই। দেশে প্রায় ১৫৫টি কর্মসূচি আছে। এটা ১০টা কর্মসূচির মধ্যে আনার কথা বলা হচ্ছে। উদ্দেশ্য হলো, কেউ যেন কর্মসূচি থেকে বাদ না যায়, আবার একজন যেন ১০টা কর্মসূচি থেকে সুবিধা না নিতে পারে।

এতগুলো কর্মসূচি একটি দেশে থাকতে পারে না। বয়স্ক, শারীরিকভাবে অক্ষম, অসুস্থ, শিশু ও গর্ভবতীদের সরকার বেশি গুরুত্বের সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আনবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এমন একটি কাঠামো থাকবে, যেখানে মালিক ও শ্রমিকের অবদানে শ্রমিক সুরক্ষিত হবে। এ জন্য যা করা দরকার, সে লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

মরিয়ম নেছা

আমরা যখন শ্রমিক বলছি, তখন সবার কথা বলছি। নারী ও পুরুষ শ্রমিক আলাদা করছি না। কিন্তু ঝুঁকিটা পুরুষ শ্রমিক থেকে নারীদের আরও বেশি। একজন শ্রমিক ৪০ থেকে ৪৫ বছর পর আর কাজ করতে পারছেন না। কারণ, কর্মক্ষম অবস্থায় তাঁর যে ধরনের পরিচর্যা দরকার ছিল, সেটা তিনি নিতে পারেননি।

কোভিডে শ্রমিকেরা কেমন ছিলেন, সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করেছি। শ্রমিকদের ওপর কোভিডের খুব খারাপ প্রভাব পড়েছে। ৩৬ শতাংশ শ্রমিক বলেছেন, কোভিডের জন্য তাঁরা কাজ হারিয়েছেন। কোভিডের সময় অনেক পুরুষ শ্রমিক রিকশা চালনাসহ কোনো বিকল্প কাজ হয়তো করেছেন। কিন্তু নারী শ্রমিকের জন্য এসব বিকল্প কাজ প্রায় নেই বললেই চলে। কারখানায় কাজের পরিবেশ নিয়ে বিস্তর অভিযোগ আছে। তারপরও একজন শ্রমিকের অন্য ভালো বিকল্প নেই বলেই তিনি কাজ করেন। কিন্তু একজন নারী শ্রমিকের জন্য সেটা আরও কতটা খারাপ অবস্থা, সেটা কি চিন্তা করি? আমাদের এক প্রশ্নের উত্তরে ৩৩ শতাংশ নারী বলেছেন, তাঁরা জেন্ডার বেজড ভায়োলেন্সের শিকার হন। প্রশ্ন করলাম ভায়োলেন্সের শিকার হলে তাঁরা কী করেন। অধিকাংশ নারী বলেন, চাকরি হারানোর ভয়ে তাঁরা কিছুই করেন না।

একজন শ্রমিককে সব সময় চাপের মধ্যে কাজ করতে হয়। কাজের প্রতি তাঁর ভালোবাসা থাকে না। চাকরি হারানোর ভয় থাকে। আমার যখন বেশি কাজ থাকে, তখন অফিস আমাকে গাড়ি দিয়ে পৌঁছে দেয়। খাবারের ব্যবস্থা করে। ভালোবাসা নিয়ে কাজটা করতে পারি। কিন্তু একজন শ্রমিকের জন্য সে সুযোগ নেই। তাই শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষা কাঠামো এমনভাবে করতে হবে, যেন সেখানে নারী-পুরুষ সব শ্রমিকের সুরক্ষা নিশ্চিত হয়।

কোহিনুর মাহমুদ

আমাদের শ্রমশক্তির প্রায় ৫ কোটি ১৭ লাখ মানুষ কাজ করেন অপ্রচলিত খাতে। প্রতিবছর ২০ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে আসছেন। এটা হলো পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৬ ও ২০১৭ সালের তথ্য। এখন এটা আরও অনেক বেড়েছে। সরকার ইউনিভার্সাল পেনশন স্কিমের ঘোষণা দিয়েছে, এটা খুবই আশাব্যঞ্জক একটি উদ্যোগ। কিন্তু সেখানে অপ্রচলিত খাতের ৬ কোটি শ্রমশক্তি যুক্ত হবে কি না, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত না। তবে এ ক্ষেত্রে সরকারের একটা নীতি থাকা দরকার। আলোচনায় শ্রমকল্যাণ তহবিলে শ্রমিকের অংশগ্রহণের বিষয় এসেছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, অপ্রচলিত খাতে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা সবাই প্রায় দিন এনে দিন খান। আবার প্রচলিত খাতে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের বেতন এত কম যে সেখান থেকে কোনো তহবিলে টাকা দেওয়া তাঁদের পক্ষে প্রায় একেবারেই সম্ভব নয়।

সরকারকে এসব বিষয় বিবেচনা করে সবার জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিকল্পনা নিতে হবে। আবার গর্ভবতী মায়েদের জন্য সরকারের দিক থেকেই একধরনের বৈষম্য করা হয়েছে। কারণ, সরকারি পর্যায়ে এ ছুটি ছয় মাস। কিন্তু বেসরকারি পর্যায়ে এটা চার মাস। যদি কোনো ল্যাকটেটিং মায়ের মাসে আয় ৫ হাজার টাকার কম হয়, তাহলে তিনি প্রতি মাসে ৮০০ করে টাকা পাবেন। তাহলে গর্ভবতী শ্রমিকেরা এ ক্যাটাগরিতে আসবেন না। কারণ, বেতন যতই কম হোক, একজন নারী শ্রমিকের বেতন তো আর ৫ হাজার টাকা নয়, নিশ্চয়ই বেশি।

একজন গ্রামের ল্যাকটেটিং মা তিন বছর ৮০০ টাকা করে পাবেন। কিন্তু তাঁর পরিবারের মাসিক আয় ৮ হাজার টাকার বেশি হলে তিনি এটা পাবেন না। আবার অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। একজন গ্রামের মায়ের পক্ষে কি এসব করা সম্ভব? এখানে বয়সসীমা করা হয়েছে ২০ থেকে ৩৫ বছর। গ্রামের অধিকাংশ মেয়ের বিয়ে হয় ২০ বছরের নিচে।

সরকারের কাছে আমাদের প্রধান সুপারিশ হলো ইউনিভার্সাল পেনশন স্কিম করতে হবে। হেলথ ইনজুরি স্কিম, সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ করতে হবে। সঠিক তথ্যভান্ডার করতে হবে। তথ্যের অভাবে কোভিডের সময় অনেক শ্রমজীবী মানুষ ২ হাজার ৫০০ টাকা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। সরকার যাদের কাছে তথ্যের জন্য নির্ভরশীল, তারাও সঠিক তথ্য দিতে পারেনি।

আজ স্বাধীনতার ৫০ বছরেও যেখানে হাত দিই, সেখানেই অনিয়ম। সিটি করপোরেশনে গেলে ঢাকা শহরের রিকশাচালকের সংখ্যা জানা যায় না। ক্লিনার নারী শ্রমিকের সংখ্যা জানতে গিয়ে দেখি, সেখানে প্রচুর ভুয়া শ্রমিক। আমার শেষ কথা হলো, পেনশন স্কিমে সবাই অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। তাঁদের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। ক্যাটাগরি অনুযায়ী পেনশন স্কিম করতে হবে।

সায়েমা হক বিদিশা

কাজ আছে কি নেই, সেটা নিয়ে তো প্রশ্ন আছেই। যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরা কী ধরনের কাজ করছেন, সেটাও একটা প্রশ্ন। ছোট কারখানায় স্বাস্থ্যসুবিধা, গর্ভপূর্ব ও পরবর্তী সেবা সেখানে নেই। আবার দেখা যায়, কোনো কোনো সুবিধার কথা খাতায় লেখা আছে। কিন্তু বাস্তবে নেই। আবার থাকলেও সেটা কার্যকর নেই। যেমন অনেক কারখানায় অসুস্থ হলে সেবা নেওয়ার কক্ষ নেই। অধিকাংশ শ্রমিককেই তার নির্দিষ্ট সময় থেকে আরও বেশি সময় কাজ করতে হয়।

অধিকাংশ কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন নেই। অভিযোগ করার জায়গা নেই। আবার অভিযোগ করলেও তেমন ফল পাওয়া যায় না। নারীদের ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি সমস্যা। পোশাকশিল্প অনেকটা প্রাতিষ্ঠানিক। তারপরও সেখানে অনেক সমস্যা আছে। আমাদের কোনো তথ্যভান্ডার নেই, এটা আরও বেশি জরুরি। শুধু পোশাক খাত নয়, সব খাতে ন্যূনতম মজুরি ঠিক করতে হবে। এর সঙ্গে মূল্যস্ফীতি সমন্বয় করতে হবে।

আমরা অনেক ক্ষেত্রে এগিয়েছি। তাই শ্রমিকের মর্যাদার ক্ষেত্রেও আমাদের এগোতে হবে। নারী শ্রমিকদের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। প্রতি কারখানায় শিশু দিবাযত্নকেন্দ্র থাকা জরুরি। একেবারে নিম্ন আয়ের মানুষের কমিউনিটি লেভেলে ডে কেয়ার সেন্টার থাকা প্রয়োজন। সামাজিক নিরাপত্তা হিসেবে এটাকেও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, গবেষণায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। দক্ষতার অভাবে আমাদের শ্রমিকের মজুরি কম। শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য সরকার, মালিক ও শ্রমিক সবাইকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। একটা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় আনতে হবে।

সৈয়দ সাদ হোসেন গিলানী

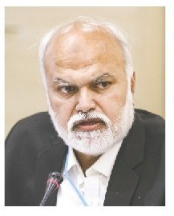

সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) মানদণ্ড নির্ধারণ করে। ১৯৪৪ সাল থেকে আইএলও এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৪৪ সালে ডিক্লারেশন অব ফিলাডেলফিয়া অভিযোজন করা হয়। এটা শ্রমিককে পণ্য নয়, মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এরপর থেকে শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষা তার অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়। এই ডিক্লারেশনের সাত বছরের মধ্যে আইএলও সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে কনভেনশন ১০২ ও ২০২ গ্রহণ করে। এর ভিত্তিতে সামাজিক সুরক্ষার নয়টি দিক চিহ্নিত হয়, যা জীবনব্যাপী সুরক্ষা নিশ্চিত করে। এসব সুরক্ষার মধ্যে রয়েছে মাতৃকালীন সুরক্ষা, শিশু সুরক্ষা, বেকারকালীন সুরক্ষা, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত সুরক্ষা, অসুস্থতাজনিত সুরক্ষা, প্রতিবন্ধী সুরক্ষা, সারভাইভার, বৃদ্ধকালীন সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা।

আইএলও কনভেনশন ১০২ অভিযোজনের প্রায় ৭০ বছর হতে চলল। যেসব দেশ সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা অভিযোজন করেছে ও মানবসম্পদ গঠনে বিনিয়োগ করেছে, এখন তারা টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ভোগ করছে। অন্যদিকে যেসব দেশ এখনো দ্বিধান্বিত, তারা বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যায় ভুগছে। দক্ষিণ এশিয়ার কোনো দেশ এখন পর্যন্ত এই কনভেনশন রেটিফাই করেনি।

বাংলাদেশ সরকার পরিকল্পনা করেছে ২০৪১ সালের মধ্যে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীত হবে। একমাত্র মানবসম্পদে বিনিয়োগের মাধ্যমে সরকারের পক্ষের এই উন্নয়ন টেকসই করা সম্ভব। মানবসম্পদে বিনিয়োগ করার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে সামাজিক সুরক্ষা প্রদান।

বর্তমানে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষানীতি ২০১৫-এর অধীনে ১০০-এর অধিক সামাজিক সুরক্ষা প্রোগ্রাম রয়েছে। সমন্বয়ের অভাব ও সামগ্রিক তথ্যভান্ডার না থাকায় এর সুফল অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না। উৎপাদনশীলতার সঙ্গে সামাজিক সুরক্ষার সুস্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা ও প্রবন্ধে দেখা যায়, সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা বিশেষত দরিদ্রদের অনিশ্চয়তা মোকাবিলা করতে সাহায্য করে। এটা আয়ের উৎস খুঁজে নিতে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে, শিশুস্বাস্থ্য ও শিক্ষায় বিনিয়োগ ও বয়স্কদের সুরক্ষা দিতে সাহায্য করে।

অনেক সময় বলা হয়ে থাকে সামাজিক সুরক্ষায় বিনিয়োগ করা অনুকূলে নয়। যেকোনো অর্থনৈতিক মন্দায় এই খাতে বিনিয়োগ কমানো উচিত। অনেক উন্নত দেশ আছে যখন তারা সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, সে সময় তাদের মাথাপিছু যায় বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের থেকে কম ছিল। কিন্তু এখন এসব দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো অনেক শক্তিশালী এবং মাথাপিছু আয়ও অনেক বেশি।

মুজিবুল হক, এমপি

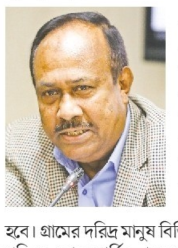

এটা সামগ্রিক আলোচনার বিষয়। বড় সমস্যা হলো আমাদের শ্রমিকের কোনো তথ্য নেই। পেশা জানতে চাইলে শ্রমিক হলেও সাধারণত বলেন যে তিনি ব্যবসা, চাকরি বা কৃষিকাজ করেন ইত্যাদি। যাঁরা প্রচলিত-অপ্রচলিত খাতে কাজ করেন, সবাই শ্রমিক। লাখ লাখ শ্রমিক অপ্রচলিত খাতে কাজ করেন। তাঁদের কথাও চিন্তা করতে হবে। গ্রামের দরিদ্র মানুষ বিভিন্ন ভাতা পেয়ে থাকেন, এঁরাও কিন্তু শ্রমিক। আর সার্বিকভাবে সারা দেশের শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তাবলয়ে আনার কোনো পরিকল্পনা সরকারের পক্ষ থেকে নেই। আবার সুধী সমাজ থেকে এ ধরনের কোনো প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে জানি না।

কারা চাকরি করেন, কারা ডেইলি কাজ করেন, কারা বেকার—বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে এঁদের ভাগ করতে না পারলে সরকারের পক্ষে সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়া কঠিন। কারণ, সবার সামাজিক নিরাপত্তা একই রকম হবে না। কোনো এনজিও হোক বা সরকার হোক, শ্রমজীবী মানুষদের একটা শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে। আমরা কেউ খুব বেশি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছি বলে মনে হয় না।

আমরা কোথাও কোনো কথা বলার সময় কিছু তথ্য হয়তো দেখে আসি। কিন্তু এসব কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য বলে মনে হয় না। হেজার্ডাস শিশুশ্রম নিরসনের জন্য তিন বছর আগে টাকা রেখে এসেছি। সেই কাজটা আজও হয়নি। আসলে আমাদের কাজ করার মানসিকতা আছে কি না, সেটাই বড় প্রশ্ন।

শ্রমজীবী মানুষের জন্য কাজ করতে হলে তাঁদের জন্য যে দরদ, ভালোবাসা থাকা দরকার, সেটা প্রায় একেবারেই নেই। যাঁরা নীতি নির্ধারণ করেন, বাজেট প্রণয়ন করেন, তাঁরা শ্রমজীবী মানুষের কথা ভাবেন বলে মনে হয় না। সামাজিক সুরক্ষানীতি যেটা হয়েছে, এটা মূলত প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতার জন্যই হয়েছে। এখানে হয়তো কিছু রাজনৈতিক সুবিধাও আছে। সব ধরনের শ্রমিককে রেজিস্ট্রেশন কার্ড প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের একটা তালিকা করতে হবে। আবার মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই। এক মন্ত্রণালয় একটা কাজ করতে গেলে অন্য মন্ত্রণালয় বলে যে এটা তার কাজ। শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে সরকারের পক্ষ থেকে একটা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি করে শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

ফিরোজ আলম

দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের বিমার জন্য ২০১৫ সালে আমরা সরকারের সঙ্গে একটা চুক্তি সই করলাম। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেটা আর এগোয়নি। রানা প্লাজা ধসের ধাক্কা আমরা খুব ভালোভাবে সামাল দিতে পেরেছি। কারণ, তখন শ্রম মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সবাই যোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য জিআইজেড শ্রমিক, মালিক ও সরকারের প্রায় ১০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জার্মানিতে তিন সপ্তাহের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। তারপরও শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হলো না। তাহলে সমস্যা কোথায়। আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত মুজিবুল হককে বিশেষভাবে অনুরোধ করব, তিনি যেন বিষয়টি আরও গুরুত্বের সঙ্গে সংসদে উপস্থাপন করেন।

ফিরোজ চৌধুরী

শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। এটা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে ভাবা প্রয়োজন। আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য *প্রথম আলোর* পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।